পুলিশ, তুমি কার.............??!!

শামসুজ্জামান সিদ্দিকী শাহীন*

সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখেছিল টগবগে যুবক তূর্য (ছদ্ম নাম)। দেশ গড়ার স্বপ্ন। একমাত্র উচচ শিক্ষা ছাড়া বিদেশ যাবে না, দেশেই ক্যারিয়ার গড়বে। দেশে কি মানুষ থাকে না? বিসিএস-র গাইড কিনছে সে। অন্য দুই ভাই দেশের বাইরে থাকায় পরিবার দেখভালের অভাবটুকু সে একাই পূরণ করবে। বাবা মাকে আগলে রাখবে, আরো কত তাজা স্বপ্ন ও প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে চলছিল তূর্য!

নামকরা একটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির বিবিএ ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র সে। মায়ের সাথে ক'টা দিন কাটাবে বলে গ্রামীন টেলিকমে ইন্টার্ণশীপ শেষ করে থিসিস জমা দিয়েই গ্রামের বাড়ীতে ছুটে গেছে ছেলেটি। সাথে নিয়েছে এক বন্ধুকে, যাকে সে নিজেদের ছায়াঘেরা সুনিবিড় গ্রাম দেখাবে। এরপর ঢাকা ফিরেই পূর্নোদ্যমে শুরু করবে নতুন ও উদ্দীপ্ত জীবন গড়ার পথ চলা। স্নেহময়ী মা তার নানান ব্যধিতে আক্রান্ত। কি নেই? ডায়াবেটিক, হাই ব্লাড প্রেসার, হার্টের রোগ সবই আছে। ছেলেমেয়েরা কাছে না থাকার বাড়তি শোকের কথা না হয় বাদই দিলাম। ঔষধপথ্য নিয়মিত সেবন করলেও মাঝে মাঝেই অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে যান। বাড়ীতে এসে তূর্য শোনে ক'দিন আগেও তার মায়ের এমনটি হয়েছিল। তখন ওকে জানায়নি। লেখাপড়ায় ক্ষতি হবে যে! তূর্য তাই বন্ধুসহ মাকে শহরে বড় বোনের বাড়ীতে নিয়ে যায় ডাক্তার দিয়ে আরেকবার চেক আপ করাতে। কিন্তু কে জানে এখানেই তূর্যের জন্য অপেক্ষা করছিল ভীতিকর ও দুঃসহ জীবনের নতুন এক অধ্যায়!

পরদিন সবাই বোনের বাড়িতে দুপুরে খাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এমন সময় টুং টাং কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলে হতভম্ব হয়ে যায় তূর্য। দুজন পুলিশ দাড়িয়ে, সাথে তাদের এক আত্মীয়ের আত্মীয় (যাকে সে নানা ডাকে এবং যিনিও কিনা প্রাক্তণ পুলিশ অফিসার)। লোকটি ওকে দেখিয়ে দিয়ে পুলিশকে বলে, এরই নাম তূর্য। কিছু বুঝে উঠার আগেই পুলিশের হুকুম, 'প্যান্টটা পড়ে নিন, আমাদের সাথে একটু যেতে হবে।' ভয় পেয়ে পাছে মায়ের কোন অঘটন ঘটে বসে ভেবে দ্রুত পুলিশের সাথে সে পথ চলে। পুলিশ ওকে তাদের গাড়ীতে বসায়। আর ওই লোকটি কাজ সমাধা হয়েছে বিধায় সটকে যাওয়ার পথ খোজে। তূর্যের ভাবলেশহীন নীরিহ চেহারা দেখে পুলিশ হয়তো খানিকটা বুঝতে পারে লোকটি ওকে অযথা ফাসাচ্ছে। তাই তাকেও ধমকিয়ে গাড়ীতে উঠায়।

এদিকে অন্য দুজন পুলিশ তূর্যকে একের পর এক হুমকি দেয়। হাত-পা ভেঙ্গে গুড়া করে দিব, তোর সাথে আর কে কে আছে বল ইত্যাদি। প্রাথমিক তদন্তেরও তোয়াক্কা না করে কান, মাথা ও বুক বরাবর প্রচন্ড বেগে তিন চারটি ঘুষি মারে পুলিশ। প্রচন্ড ব্যাথায় কুকড়ে উঠে তূর্য। আকাশ ভেঙ্গে মাথায় পড়ে তার। কি বলবে সে? ভদ্রবেশী ওই অমানুষটাকে সে জিজ্ঞেস করে, নানা আমি কি করেছি? নানা উত্তরে জানায় গত রাতে সে ৫ লাখ টাকা নিয়েছে। অবাক হয়ে তূর্য জানতে চায় টাকা নিব কেন, সে টাকাই বা কোথায় রেখেছি, কোথা থেকে নিলাম, আমার বাবার কি টাকা নাই, এসব কি বলছেন? লোকটি এবার এলোমেলো ভাবে পুলিশকে জানায়, রাতে নিয়েছিল, আজ সকালে ফেরৎও দিয়েছে। পুলিশ লোকটিকে হুমকি দিয়ে জিজ্ঞেস করে, টাকা যদি ফেরৎ পেয়েই থাকেন তবে আসছেন কেন, আপনাকেও ছাড়ছি না, ইত্যাদি। কিন্তু থানায় আসার পর অজানা অথবা জানা কারনে তাকে ছেড়ে দেয়া হয় আর তূর্যকে ভরা হয় লক আপে।

মামলা সাজানো হয় সম্পূর্ণ উল্টাভাবে। জেলা পুলিশ লাইন থেকে তূর্যকে ধরা হয়েছে, টাকা সহ! মানে 'পুলিশে সে লোক নিয়োগ দিবে' কথা বলে মানুষজনের কাছ থেকে টাকা নিতে সে ঢাকা থেকে এসেছে বন্ধুবান্ধবসহ। আর আমাদের চৌকষ পুলিশবাহিনী তাকে ধরে ফেলেছে টাকা লেনদেনরত অবস্থায়! কি অদ্ভূত, পৃথিবী!

ওদিকে উৎকন্ঠিত অসুস্থা মা, ছেলে এখনো ফেরে না কেন? ঘুমের ট্যাবলেট খাওয়ায়ে তাকে রাখতে হয় দিনের পর দিন। বাবা স্কুল শিক্ষক, সজ্জন হিসেবে এলাকায় সমধিক পরিচিত। কয়েকমাস পরেই রিটায়ার্ড হবেন। পাগলের মত এদিক ওদিক ফোন করেন। খবর চলে যায় তূর্যের পারিবারিক বন্ধু এক এএসপির কাছে। তিনি ফোন করেন সংশ্লিষ্ট জেলার এসপি বরাবর। ভাল মানুষ হিসাবে জেলায় এসপির নামডাক আছে। তিনি তূর্যের পারিবারিক খবর নিতে শুরু করেন। কোন খারাপ রিপোর্ট পান না। কষ্টেসৃষ্টে তূর্যের বাবা-মা দেখাও করেন এসপির সাথে। জানতে চান তাদের ছেলে কি অপরাধ করেছে?

ইউনিভার্সিটিতে কি সে কোন আইনবিরোধী কাজের সাথে জড়িত? পুলিশ সব কিছু এবার বুঝতে পারে। সম্পূর্ন ঈর্ষাপরায়ন বশত সম্ভাবনাময় তরুন ছেলেটাকে ফাসিয়ে দিয়েছে আত্মীয়রুপী ওই অমানুষটি। এসপি, এএসপি সহমর্মিতা দেখালেও থানার ওসি তূর্যকে ছাড়ে না। থানার ব্যাপার স্যাপার যারা বোঝে তাদের সাথে যোগাযোগ করে তূর্যের আত্মীয় সজন। ওসিকে বখশিস দেয়া হয়। ইতিমধ্যে ওসি বেচারা নাকি বেশ খ্যাতি অর্জন করেছেন ওসিগিরী করে রাজশাহীতে সম্পদের পাহাড় গড়ে।

দেশের মাটিতে কামড়ে পড়ে থাকবে বলে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সম্পূর্ন বিনা কারনে শুরু হল তার নতুন জীবন। এই কচি বয়সে সমাজের প্রভাবশালি ও উচচ শিক্ষিত তথাকথিত ভদ্রমানুষদের সুফী চেহারার আড়ালে ঘৃন্যরুপের কিয়দংশ এক এক করে দেখতে শুরু করল সে। তার বাবার ছাত্র ও পারিবারিকভাবে শুভাকাংখী জেলার অত্যন্ত পরিচিত এক আইনজীবি ওসিকে বলছে, আর কি কি কেইস ওর বিরুদ্ধে সাজানো যায় বলুন। আরেকজন যাকে কিনা সারাজীবন আপনজন বলে জেনেছে, ফোনে পুলিশকে বলছে, পিটিয়ে কথা বের করতে। চোখের সামনে দেখল সামান্য একশো টাকার বিনিময়ে এক খুনীকে কিভাবে পুলিশ ছেড়ে দিল। এক পুলিশ ওকে এসে বলল, আপনার আপাকে আমার সাথে দেখা করতে বলুন, তবে এটি ভাববেন না যে আমি ঘুষ চাচ্ছি। আকাশের দিকে চেয়ে থাকে তূর্য, বোঝে না কি করবে সে। যে ধারায় তার বিরুদ্ধে মামলা সাজানো হচ্ছে, তাতে নাকি তার সাত বছরের জেল হবে। তার মত অনেক নিরপরাধ ছাত্র, কিশোর, যুবার সাথে পরিচয় হয় জেলের ভিতর। নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে আৎকে উঠে তূর্য। বাইরের পরিচিত মানুষজন তাকে নিয়ে কি ভাবছে? তারা কি তাকে ভুল বুঝছেনা? কিভাবে তাদের সামনে সে মুখ দেখাবে? ছাড়া পেয়ে কয়জনকে সে বুঝাবে?

যাহোক, এসপি ও এএসপির বদান্যতায় শেষমেশ তূর্য ছাড়া পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ভয় তাকে ছাড়েনি। আগেরমত তার প্রত্যয় নেই, দেশের থাকার অদম্য বাসনাও নেই। প্রতিশোধের স্পৃহা সারাক্ষন তাকে তাড়া করে বেড়ায়। ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেদে বলছিল আমাকে কোন কিছু না লিখতে। না জানি কখন আবার পুলিশ এসে তাকে কোন অজানা কারনে বা কোন ধারায় ধরে নিয়ে যায়।

তার সম্ভাবনাময় জীবনে আর নতুন কোন অঘটন ঘটুক তা অবশ্যই চাইনা বরং তার চলার পথ আবার শুভ হোক তাই-ই কামনা করি। কিন্তু একদম নিরবতাকে নিজের বিবেকের কাছে কোনমতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। পত্র পত্রিকায় লেখালেখির সুবাদে অনেকেই মেইল করে, ফোন করে তাদের জীবন ঘনিষ্ঠ অনেক সমস্যার কথা বলেন। মানুষের কাছে তাদের মনের আকুতি তুলে ধরতে বলেন। ভাবলাম এসব নিয়ে আমি কিভাবে কলাম লিখব? যেদেশে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীরা সরাসরি মাস্তানী ও লাঠি মিছিলের সাথে জড়িত, খোদ প্রধানমন্ত্রী যেদেশে এক লাশের বদলে দশ লাশ ফেলে দেয়ার হুকুম দেন, ওসির নির্দেশে প্রতিবেশীর জমি-বাড়ী ভোগ দখলের খায়েশে দিন দুপুরে তীতুমীর কলেজের ছাত্রকে হত্যা করা হয়, যৌতুকলোভী শয়তান স্বামীদের নির্যাতনের শিকার হয়েও নারীরা পুলিশকে কাছে পায় না, যেদেশে ইয়াসমীন, রাহেলা, নূরজাহান আর কত নাম না জানা কৈশোরী, তরুনীর অকাল জীবনের করুন পরিসমাপ্তি ঘটে, মুটে মজুরদের পুলিশের নিকট ন্যায় বিচার পাওয়া একধরনের বিলাসিতা, সেদেশে আমি কত জনের কথা লিখব? তাও আবার পুলিশের বিরুদ্ধে যে বিভাগে কিনা আমার আত্মীয় সজনদের বিরাট অংশই নিম্ন থেকে উচচ পদে কর্মরত? তবুও অজস্র মজলুম হতভাগাদের মধ্য থেকে তূর্যের কথা লিখছি, কারন তার কান্না আমাকে সরাসরি শুনতে হয়েছে। প্রায় সপ্তাহ খানিক ধরে ভেবেছি আমি কি সত্যি কিছু লিখব না? কেমন করে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকি যেখানে আমার কিনা মুক্ত অস্ত্র (কলম)কে কেউ লাগাম টেনে ধরতে পারবেনা। যে লেখায় প্রানের স্পন্দন থাকে না, মাটি ও মানুষের চাপা কান্না থাকে না, জীবনবোধের দোলা থাকে না, হৃদয়ের স্বরন থাকে না, জীবনের জয়গান থাকেনা, তা আবার কিসের লেখা?

একটা সুস্থ ,সুন্দর ও সভ্য সমাজ বিনির্মানের প্রধান সোপান হল আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও সবার প্রতি মানসম্মত আচরন। কোন সমাজ থেকেই মিথ্যার বেসাতি ও অপরাধ সমূলে নির্বংশ করা আকাশ কুসুম কল্পনা বৈ কিছু নয়। কিন্তু সেসব নিয়ন্ত্রণে রাখতে গিয়ে নিয়ন্ত্রকরাই যদি সমান বা তার চেয়েও বেশী অপরাধে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে অসহায় মানুষরা যাবে কোথায়? পুলিশের কোন্ আইজি যেন বলেছিলেন, যদি পুলিশরা সামগ্রিকভাবে কোন অপরাধের সাথেই জড়িত না হত, তবে সারাদেশে অপরাধ আপনা আপনিই কমে যেত।

এনটিভিতে কিছুদিন আগে কয়েকটা এনজিও প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময়কালে পুলিশের আইজির বক্তব্য মনযোগের সাথে দেখছিলাম। তিনি পুলিশদের একটু ধাক্কা দিতে অনুরোধ করছিলেন যাতে করে তারা অল্প বেশী নড়ে চড়ে ওঠে, অচলায়তনের শক্ত খুঁঠি ভেঙ্গে একটু হলেও সচল হয়। বৃটিশদের পৌণে দুইশো বছর শাসনের ধারাবাহিকতার ফসল পুলিশের এই সেবাহীন মনোভাবের বর্তমান ধারা আগামী একশো বছরেও পরিবর্তন হবে কিনা তা নিয়ে পুলিশের খোদ আইজিই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। একথা বলতে আজ দ্বিধা নেই যে, উপমহাদেশে বৃটিশদের দীর্ঘদিনের দস্যুপনার শিকার হতে হয়েছে সরকারী ,বেসরকারী সহ প্রতিটা বিভাগ ও ক্ষেত্র। জনগনকে সরকার ও তাদের বিভাগসমূহ থেকে দূরে রাখার প্রবণতা নিয়েই তাদের মত করে গড়ে তুলেছিল বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন। তৈরি করেছিলে একদল এলিট শাসক শ্রেনী যারা কিনা আমজনতার ধরাছোয়ার বাইরে থাকবে। আদালতকে ‘লর্ড’ বলা তারাই শিখেয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ‘একান্ত ও বাধ্য অনুগত ছাত্র’ তৈরির কারিকুলাম তারাই সাজিয়েছে। পাকিস্তানীরা ২৩ বছরের শাসনের জন্য যদি একবার ক্ষমা চায় তবে বৃটিশদের ভদ্রবেশী দস্যুবৃত্তির জন্য আমাদের নিকট কমপক্ষে সাতবার ক্ষমা চাওয়া উচিৎ।

সাধারন মানুষের মনের ভিতর থেকে না বলা কথা টেনে এনে আইজি নূর মোহাম্মদ বলেছিলেন, ‘এই বিভাগটি মূলত রক্ষক না হয়ে ভক্ষকের ভূমিকায়ই বেশী চালিত হয়। তা পরিবর্তন করতে হবে।’ সত্যিকার সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে এটিকে পরিনত করার কঠিন চ্যালেঞ্জ তিনি হাতে নিয়েছেন। কতটুকু সফল হবেন জানিনা, তবে একথা সত্যি মুষ্টিমেয় কিছু অসৎ পুলিশ সদস্যদের কারনে আজ গুরুত্বপূর্ন এই আইন শৃংখলা রক্ষা বাহিনীর পচন কেউ ঠেকাতে পারছেনা। এরশাদের বেপরোয়া পুলিশ, খালেদা ও হাসিনার গনতান্ত্রিক পুলিশ, জরুরী অবস্থার পুলিশ-জনগন সবই দেখেছে। কিন্তু মানুষের পুলিশ কোথায়? বিন্দু বিন্দু এই ক্ষোভ জমা হতে হতে আগ্নেয়গিরির লাভা হয়ে যখন পুরা বাহিনীকে খেয়ে ফেলবে তখন আর করার কিছুই থাকবেনা। দেশটাও রসাতলে চলে যাবে। খুব জরুরী ভিত্তিতে এই বাহিনীকে পেটোয়া বাহিনী থেকে মানুষের কল্যানের বাহিনীতে ঢেলে সাজানোর জন্য ‘ত্রি টি (ট্রেনিং, টেকনোলজি ও টাকা বা উন্নত পারিতোষিক)’ বাস্তবায়নের উদ্যোগ দ্রুত নেয়া উচিৎ। দেশ বিদেশ থেকে উন্নত প্রশিক্ষক এনে সেবামূলক নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, বিশ্বমানের উন্নত প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ রপ্ত ও সর্বোপরি উন্নত বেতন ভাতার ব্যবস্থা থাকা উচিৎ।